চতুর্থ সেমিস্টার এর বিদ্যার্থীদের জন্য পাঠ সহায়ক

প্রণয়নে
ড.মাল্যবান চট্টোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, আসানসোল গার্লস কলেজ।

বিষয়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় –এর উপন্যাস ও বাংলার ইতিহাস : সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে যোগাযোগ প্রাচীন কাল থেকেই। কিন্তু সাহিত্য কতটা ইতিহাস হয়? এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অশীন দাশগুপ্ত বলেছেন যে ,

" ইতিহাস কোন না কোন ভাবে অতীতকে আশ্রয় করে। সেই অতীত থেকে ইতিহাস তথ্য সঞ্চয় করে। সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন ব্যাখ্যা করে। ইতিহাস পুরোপুরি বিজ্ঞান হতে পারে না, কারণ ইতিহাসের তথ্য এবং বিজ্ঞানের তথ্য একরকম নয়। তাছাড়া সাধারণ নিয়ম তৈরি করতে গেলে যত তথ্য লাগে তার সামান্য অংশও ঐতিহাসিকের ভাগ্যে জোটে না। এ বাদেও অন্য একটি সমস্যা আছে। ইতিহাস মানুষের, কিন্তু ঐতিহাসিক মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন না। সাহিত্য চিরকালই এই কাজটি করেছে, এখনও করে। সাহিত্যে যে-সত্যের প্রকাশ, ঐতিহাসিকের তা ঈর্ষার বস্তু । কিন্তু সাহিত্যিকের স্বাধীনতা ঐতিহাসিক স্বেচ্ছাচার বলে স্বেচ্ছায় বাদ দিয়েছিলেন। ইতিহাস ক্রমেই বিজ্ঞান ধর্মী হয়ে উঠেছিল। ইদানীংকার ইতিহাসচর্চায় মানুষের মনের কদর বাড়ছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ভিত্তি করেই, ঐতিহাসিক মানসিকতার সন্ধান করছেন। "

এই মনের সন্ধান করার ক্ষেত্রেই ইতিহাসের দরকার হয় সাহিত্যের। এখানেই গুরুত্ববহ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে ঔপনিবেশিক বাংলার মনন কে বোঝা যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩ আগস্ট, ১৮৯৮- সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯৭১) বিংশ শতাব্দীর একজন কথাসাহিত্যিক ছিলেন। তার সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে ৬৫টি উপন্যাস, ৫৩টি গল্পগ্রন্থ, ১২টি নাটক, ৪টি প্রবন্ধের বই, ৪টি আত্মজীবনী, ২টি ভ্রমণ কাহিনী, ১টি কাব্যগ্রন্থ এবং ১টি প্রহসন । এই বিশিষ্ট সাহিত্যিক রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার,পদ্মশ্রী এবং পদ্মভূষণ পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

তাঁর বিভিন্ন উপন্যসের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে সমকাল । তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে যার নাম ছিল চৈতালী ঘূর্ণি । ১৯৩১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি একাধিক উপন্যাস লিখেছেন তিনি। লক্ষ্য করার বিষয় হল, তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে দেশকালকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তিনি ব্যক্তিজীবনের কথাকার নন, তিনি বিশাল জনপদ তথা মানব- ইতিহাস লিখতে চেয়েছেন। এক সময় তিনি ভেবেছিলেন উনিশ ও বিশ শতকের ভারতবর্ষের ইতিহাস ও উপাখ্যান নিয়ে মহাভারতের মত নবভারত লিখবেন -

"সকল প্রকার ধমনীতি রাজনীতি সমাজনীতির প্রভাব থেকে উর্দ্ধে আসন পেতে শতবর্ষের জীবন-যুদ্ধকে বিচার বিশ্লেষণ করা হোক। নায়ক স্থির হোক। শেষ স্থির হোক। মহাত্মার জীবনাবসানে এ ছেদ বা সমাপ্তিতে মহানাটকীয় সমাপ্তি দেখতে পাই আমি। তারপরও দেখি শতবর্ষের সার্থকতার মধ্যে যে অসার্থকতা - আলোর পশ্চাদনুসারিণী ছায়ার মত — দেশ-বিভাগ ও দেশত্যাগীদের লাঞ্ছনা ও দুর্দশার মধ্যে আবার নতুন জীবন-দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। এই অসমাপ্তির মধ্যেই জীবনের চলমানতার ইঙ্গিত। এতেই এই মহাকাব্যের শেষ। এই মহাকাব্যের একটি অংশ লেখবার ইচ্ছা আমার হয়। "
(যে বই লিখতে চাই)।

সারাজীবনে তিনি যা কিছু লিখেছেন তা যেন এই মহাকাব্যের খসড়া। সে সব রচনায় আংশিকতা লক্ষণ বড় বেশি, কাহিনীগ্রন্থন-এর ক্ষেত্রতেও শৈথিল্য আছে— যা চেয়েছিলেন তা তিনি পারেন নি হয়ত -কিন্তু যা পেরেছেন তার মূল্য সাহিত্যিক দিক থেকেও যেমন আছে, তেমন আছে ইতিহাসের দিক থেকেও।

চৈতালী ঘূর্ণি -তে স্পষ্টভাবে ঘটনাকাল দেশ করা না হলেও তারাশঙ্করের প্রথম পর্বের অধিকাংশ উপন্যাসের মতো এখানেও প্রথম মহা যুদ্ধোত্তর গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক সংকট এবং শহরমুখী মানুষ দ্বিধা-বর্ণনা থেকে ঔপন্যাসিকের ইতিহাসবোধের পরিচয় মেলে। জমিদার-মহাজনের অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে গোষ্ঠ-দামিনী আধা শহরে আশ্রয় নেয়। ধানকলে মজুরের চাকরি পায় গোষ্ঠ। উপন্যাসের শুরুতে গ্রামবাংলার হতশ্রী রিক্ততার যে-ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা দুর্ভিক্ষের ফল শুধু নয়, অনেকদিন থেকে এই পরিবর্তনের সূচনা তা তিনি উল্লেখ করেছেন বার বার,

"সমস্ত গাঁটা যেন আবছা ধোয়াতে ছেয়ে গিয়েছে। নদীর ওপরেই শ্মশানের ছাই উঠছে••• গাঁয়ের মাঝ থেকে একটা সাড়া নেই,-- যেন সব মরে গিয়েছে ; -- আমার বুকখানা কেমন করে উঠল বাপু'

কিন্তু একই ভাবে শহরে দু মঠো অন্ন জুটে যাবার সুত্রে মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটে তা তিনি লিখেছিলেন। তবে তারাশঙ্কর এর মধ্যেও পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেন- চৈতালী ক্ষীণ ঘূর্ণি অতিক্রম অতিক্রম করার। কালবৈশাখীর ঝড়ে সব কিছু ভেঙেচুরে কেমন করে নতুন জীবন সম্ভাবনায় সত্য হয়ে উঠবে তার সন্ধান তখনও ঔপন্যাসিকের জানা নেই। কিন্তু চৈতালী ঘূর্ণি পড়েই বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মনে হয়েছিল, "যুগান্তর, যুগের transition, যুগ-সংঘর্ষ নিয়ে যা ভালমন্দ এইতেই যেন সবচেয়ে মেতে ওঠে তাঁর কলম। " যুগের ইতিহাস যিনি লিখছেন, তাঁকে যুগান্তরের স্বরপ সম্বন্ধে অবহিত হতেই হয়।

চৈতালী ঘূর্ণি এর সঙ্গে 'ধাত্রীদেবতা'–এর (১৯৩৯) প্রত্যক্ষ কোন যোগ নেই, কিন্তু পরিবর্তশীল সমাজের সংঘাতের চিত্রের মধ্যে ঔপন্যাসিকের দষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এখানে। তারাশঙ্কর তাঁর আত্মজীবনীতে যে-কালগত ধারনার কথা বলেছেন, আত্মজৈবনিক উপন্যাস ধাত্রীদেবতাতে তার বিশদ বর্ণনা মিলবে,

' এমনি দ্বন্দ্ব সমারোহে সমৃদ্ধ লাভপুরের মৃত্তিকায় আমি জন্মেছি। সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দু চোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি'।

ধাত্রীদেবতার শিবনাথ এর মধ্যে দিয়ে সেই সময়ের রাজনীতি সমাজ– ইতিহাসকেই উঠে আসতে দেখা যায়। শিবনাথের সমাজসেবা বা বিপ্লবী দলে যোগদান হয়তো যথার্থ কোন পরিবর্তনের সূচনা করেনি, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর কারাবাস যুগান্তরের ইঙ্গিত দেয় । অন্যদিকে নতুন ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে জমিদারের বিরোধ উঠে হয়েছে এখানে। এই নূতন পুরাতন বিরোধ তার উপন্যাসের অন্যতম দিক। যা পরেও লক্ষ্য করা যায়। বাংলার ইতিহাসের সাথে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে যোগ বিদ্যমান তা এখানে উঠে আসে। এই ঘটনার ও এই সময়ের উল্লেখ তারাশঙ্করের মনে এবং উপন্যাসে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। রাঢ়ের গ্রাম সমাজের পরিবর্তন এর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন বার বার তাঁর সাহিত্যে । কলের মালিক, কয়লাখনির মালিক আর আহমেদপুর-কাটোয়া ও নলহাটি-আজিমগঞ্জ শাখা-রেলপথ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে গ্রামের যে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বদল এসছিল তা তিনি উল্লেখ করেছেন বার বার ।এর বৃহত্তর তাৎপর্য খুজেছেন তিনি। 'ধাত্রীদেবতা'তেই লেখক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন,

"দ্রুততম গতিতে পৃথিবীর সকল দেশে বিপ্লব ঘটিয়া চলিয়াছে, রাশিয়ায় স্বৈরাচারতন্ত্র নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝাতাড়নায়।"

ধাত্রীদেবতা এবং কালিন্দী (১৯৪০) মধ্যে রচনাকালগত ব্যবধান সামান্য। জমিদার-পরিবারের অন্তর্কলহ এখানে আরও তীব্র জটিল রপে ধারণ করেছে। জমিদারি মনভাব প্রসঙ্গে এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র ইন্দ্র রায় বলেন যে তাদের জমিদারির সনদ বাদশাহী আমলের আর বেগার ধরার অভ্যাস তাদের অনেক দিনের। এখানেই তাদের জমিদারি মনোভাব কে ভাষা দেন সাহিত্যিক ইন্দ্রের মাধ্যমে ,
'কেউ ছাড়তে বললেই কি ছাড়া যায়? বেগার আমরা চিরকাল ধরে আসছি, ধরবো'

এখানেই গ্রামের মধ্যে আসা নুতন আর্থিক শক্তি মিল মালিকের সাথে জমিদারের বিরোধকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। মিল-মালিক মুখার্জি সাহেবের সঙ্গে ইন্দ্র রায়ের ঝগড়া-বিবাদ এর তীব্রতা তাই কথাকাটাকাটিতে সীমাবদ্ধ থাকে না- শেষ পর্যন্ত মামলা হয়। মামলায় জমিদারপক্ষ পরাজিত হয়।

এভাবেই যুগ বদলে যাওয়াকে কলমে তুলে ধরেছেন তিনি। তারাশঙ্কর জানিয়েছেন যে বিপ্লবী যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাকে বলেছিলেন, গণদেবতা পড়ে তিনি চমকিত হয়েছিলেন। বিপ্লবীর মনে হয়েছিল যে সাহিত্যিক বিপ্লবী কাজ কর্ম খুবই স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। 'গণদেবতা (১৯৪২) – তে বিপ্লববাদী যতীন প্রধান চরিত্র নয়, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে লেখক অনাগত ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। গণদেবতা উপন্যাসের আসল তাৎপর্য সমাজস্থিতির বিপর্যয় ও চেতনার উন্মেষ– এর নিরিখে।

তারাশঙ্করের অধিকাংশ উপন্যাসের মতো 'গনদেবতা'তেও বদলে চলা সময়ের ছবি অঙ্কন করার সচেতন প্রয়াস দেখা যাবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই এই পরিবর্তনের সচনা-

"আঃ সেই তেরশো একুশ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল,যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে পচিশ সালে ; আজ তেরশো উনিশ সাল– আজও বাজারের আগুন নিবিল না। কঙ্কণার বাবুরা ধুলামুঠা সোনার দরে বেচিয়া কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আনিতেছে আর কালীপুরের জমি কিনিতেছে মোটা দামে। ধূলা বৈকি। মাটি কাটিয়া কয়লা উঠে - সেই কয়লা বেচিয়া তো তাহাদের পয়সা। যে কয়লার মণ ছিল তিন আনা, চোদ্দ পয়সা, আজ সেই কয়লার দর কিনা চোদ্দ আনা।"

এভাবেই যুদ্ধ–এর সুযোগে ব্যবসা করে কিভাবে গ্রাম বাংলার ক্ষমতার কেন্দ্রে উঠে এসেছিলেন ব্যবসায়ীরা এবং সনাতন জমিদাররা চলে যাচ্ছিলেন বিস্মৃতির আড়ালে (আর্থিক ও সামাজিক ভাবে) তা তিনি দেখিয়েছেন। কয়লা আগেও ছিল কিন্তু তাকে ব্যভার করে ভাগ্য বদল করে জমিদারদের আর্থিক ক্ষমতা কেও যে প্রশ্নের মুখে ফেলা গিয়েছিল তা তিনি এই উপন্যাসে দেখিয়েছিলেন। সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন বিশ্বযুদ্ধ কিভাবে বাংলার অর্থনীতি কে প্রায় সেশ করে ফেলেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল–কে স্পর্শ করে তাঁর আরেকটি উপন্যাস মন্বন্তর (১৯৪৪)।

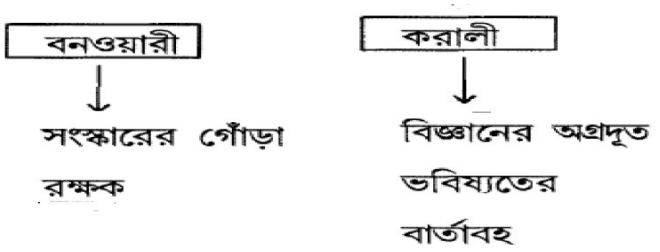

বিশ্বযুদ্ধের সময়ের মুদ্রাস্ফীতি , কালোবাজারি, কিভাবে স্থিতিশীলতাকে বদলে দিয়েছিল তা তিনি এখানেও দেখিয়েছেন।

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা এর মধ্যে দিয়েও এই প্রবণতা প্রতিভাত হয়। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস যার মধ্যে দিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন ভাবনাগুলি একটি সঙ্ঘবদ্ধ রূপ পেয়েছে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে এই উপন্যাসে বীরভূমের কাহার জনগোষ্ঠীর জীবনের কথা উঠে এসেছে। এই কাহারা মূলত ছিলেন নীলকরদের অধীনে কর্মরত মানুষ। নীলকরদের অত্যাচার এবং নিয়ন্ত্রণ এর পরবর্তীকালে তারা হয়ে উঠেছিলেন পালকি বাহক এবং অন্যান্য কাজে নিযুক্ত মানুষ। এদের জীবনের সঙ্গে জুড়ে থাকা বিভিন্ন ঘটনাকে লেখক তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এদের জীবনকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখতে পেরেছিলেন তা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছিলেন।

নীলকর সাহেবদের পরবর্তীকালে এরা তাদের আদিবাস বাঁশবাদি গ্রামেই থেকে যায় কিন্তু বদলে যেতে থাকে সমীকরণ।কোপাই নদীর হাঁসের গলার মত জেবাক সেই বাকের তীরে থাকা এই গ্রামের কাহার দের জীবনযাত্রা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাবে লেখা লেখনীতে উঠে এসেছে আর সেখানে লেখক উল্লেখ করেছেন যে কীভাবে তারা প্রথাগত পেশা থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পেশার সঙ্গে নিজেদের জুড়ে ফেলেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উপন্যাসেই উঠে এসেছে বিভিন্ন মানুষের কথা যারা আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হবার সাথে সাথে নিজেদের গোষ্ঠীগত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এই উপন্যাসে এ রকমই একটি চরিত্রের কথা তিনি বলেছেন যার

নাম করালী। এই মানুষটি রেলের গ্যাংম্যান এর কাজ করতেন আর সেই সূত্রে সে নিজের গোষ্ঠীর সনাতন ভাবনা গুলোর থেকে কিছুটা সরে গিয়েছিল বলাই বাহুল্য। পাশাপাশি এই মানুষটি নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে থাকা সংস্কার গুলি কে মানতে চাইতেন না। এই মানা না মানার মধ্যে দিয়েই উপন্যাসে একটা সংঘাতের বাতাবরণ ও লক্ষ্য করা যায় যা আধুনিকতার গ্রামাঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে অনেকাংশেই যুক্ত। এখানে হেরে যেতে থাকে বনওয়ারী এর মত মানুষজন ও তাদের মূল্যবোধ।

এর পাশাপাশি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রে কাহারদের এই বাঁশবাদি গ্রামের বাঁশঝাড়,ঐতিহ্যবাহী বটগাছ ও বনজ সম্পদ , প্রায় সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই হাঁসুলী বাঁকের উপকথা গুলো বেঁচে থাকার পরিসর গুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের বাতাবরণে। এভাবেই আধুনিক বিশ্বের চাপে পড়ে কিভাবে গ্রামবাংলা এবং গ্রাম সমাজ পরিবর্তিত হয়েছে তা আরো একবার এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে গেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপন্যাসেই করালি চরিত্রটির মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে কি করে গ্রামের প্রভাবশালী মানুষজন তাদের ক্ষমতার বিস্তার ঘটানোর ক্ষেত্রে বাধার মুখোমুখি হয়েছিলেন ।এক্ষেত্রে এই করালি তার পূর্ববর্তী প্রজন্মের মত গ্রামের উচ্চবর্গের মানুষের দমন-পীড়ন কখনোই মেনে নেয় নি বরঞ্চ প্রতিবাদ জানিয়েছে আর এই প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে একটা বদলে ইঙ্গিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়ে গেছেন তাঁর উপন্যাসে। চন্দনপুর রেলস্টেশন এর রেল কারখানায় কর্মরত এই করালি যেন কাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছিল । এভাবেই বার বার লেখক বাংলার সমাজ বদলের কথা বলেছেন তার উপন্যাস-এ । পাশাপাশি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খুব গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন সেই সময় -এর অর্থ রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের কথা। একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অত্যাচার এবং আর্থিক শোষণ ও অন্যদিকে আধুনিক প্রযুক্তির তথা রেলপথের হাত ধরে গ্রামজীবনের বদলে যাওয়ার কথা ও নূতন পেশার আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসে।

এই করালীর বক্তব্যের মধ্যে দিয়েই লেখক দেখিয়েছেন যে আধুনিক পেশার হাত ধরে দরিদ্র নিম্ন বর্ণের মানুষ নতুনভাবে সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কাহারদের মধ্যে থাকা প্রধান ও তাদের পুরনো ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধগুলো ক্রমেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল এবং সেই ধ্বংসের সাথে সাথে জুড়ে ছিল আধুনিক পেশার সূত্রে এবং নতুন আর্থিক সমীকরণের সূত্র গুরুত্ববহ হয়ে ওঠা মানুষগুলি। এক্ষেত্রে বলা জরুরী যে দেখা যাবে অন্যান্য উপন্যাসের মতো এখানেও তিনি দেখিয়েছেন যে জমিদারি ব্যবস্থার হাত ধরে যারা এককালে গ্রামাঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন তারা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্রমে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছেন এবং এই উপন্যাসে সেটি চন্দনপুর রেলস্টেশন এর কাছে থাকা কারখানায় কাজের সূত্রে করলির আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার নিরিখেই প্রতীয়মান হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এটা খুব স্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন যে যন্ত্রসভ্যতার হাত ধরে এই কাহার সম্প্রদায়ের মানুষজন। মাটির থেকে অনেকটাই দূরে সরে গিয়েছিল তারা চন্দনপুর এর ঘুপচি রেল কোয়ার্টারে থাকা শুরু করে দিয়েছিল কিন্তু সেখানে থেকেও তারা দূরে বালিভারা হাঁসুলী বাঁকের দিকে তাকায় । তাকিয়ে ভাবে তাদের অতীত জীবনের কথা, প্রকৃতি কেন্দ্রিক জীবনের কথা। এভাবেই তাঁর উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সমকালের আর্থিক পরিস্থিতি ,রাজনৈতিক সমীকরণের বদল এবং বিশ্বে ঘটে চলা ঘটনাগুলির স্থানিক প্রভাব এর কথা উঠে এসেছে। পাশাপাশি উঠে এসেছে পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এক গোষ্ঠীর কথা। যন্ত্রসভ্যতার হাত ধরে যারা নদী কিনারের বাসস্থান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল রেল কোয়ার্টার্সের দিকে। আধুনিকতাকে এভাবেই তিনি দেখাতে চেয়েছেন। সমাজ এর বদল ঘটার বিভিন্ন দিক তার লেখায় এভাবেই উঠে এসছে।

অনেকগুলি স্তরে তারাশংকর বদলে যাবার সময় কে দেখেছেন যেখানে জমিদারি ব্যবস্থার দাপট থেকে এই ব্যবস্থা বিলোপ সাধন এর সময়কাল সবই রয়েছে । আর এই পরিবর্তনের ইতিহাসই

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে উঠেছে যা শুধু হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বা গণদেবতা নয় তার অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে।

পাঠ সহায়ক প্রণয়নে ব্যবহৃত উৎস

- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী, (গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও অন্যান্য সম্পাদিত)১ম থেকে ৭ম খণ্ড , মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।
- অশীন দাশগুপ্ত , ইতিহাস ও সাহিত্য,আনন্দ,১৯৮৯।
- Mahasweta Devi, Tarashankar's World Of Changes And The New Order, Indian Literature , Vol. 12, No. 1 , Sahitya Akademi, India, 1969।
- অলোক রায়, তারাশঙ্করের উপন্যাসে দেশ-কাল, বিকাশ শীল(সম্পাদিত),জনপদপ্রয়াস (পত্রিকা -তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা), ১৯৯৮।
- Sharada Ghosh, *Tarashankar Bandyopadhyay's Concept of Nature: The Context of "Hansuli Banker Upakatha*, The Quarterly Review of Historical Studies,(April 2005 to September 2005 Nos. 1&2,Vol. XLV) The institute of Historical Studies, Kolkata,2005. ISSN no. -0033-580.